শাপমোচন

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক
জিয়াউল হাসান নিয়াজ

প্রচ্ছদ
রুদ্র কায়সার

প্রকাশনী
প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

বইমেলা পরিবেশক
নয়া উদ্যোগ

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স
বাবুগঞ্জ বরিশাল

শারদীয়া পূজা।

বাংলার ঘরে ঘরে আনন্দের ঢেউ। এত মন্বন্তর, মহামারী ছাপিয়ে এ আনন্দের স্রোত বাংলার গ্রামে গ্রামে প্লাবন এনেছে, চিরদিনই আনে। খাদ্যে রেশন; কাগজ কন্‌ট্রোল, কর্মে ছাটাই, তবুও বাঙালি মহা পূজার আয়োজনে ব্যস্ত।

মহেন্দ্র কিন্তু কিছুই করতে পারলো না। বাড়িতে অন্ধ দাদা, অসুস্থ বৌদি আর একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র খোকন, এই তিনটিমাত্র প্রাণীর জীবনে নিতান্ত তুচ্ছ একটা মাটির প্রদীপের আলোও সে জ্বালাতে পারলো না, নিরাশ হয়ে ফিরে এলো, মহেন্দ্র শুধু খোকনের জন্য একটা পাঁচ সিকের সূতীর জামা কিনে।

ওতেই আনন্দ হয়তো উথলে উঠতো বাড়িতে, কিন্তু খোকার শরীর ভালো নেই, ওদের নয়নের জ্যোতিটুকু মলিন হয়ে উঠলো। সপ্তমীর দিন একটু ভালো থাকলো খোকন, অস্টমীর দিন কাকার গলা জড়িয়ে বললো :

কলকাতা যাবে না কাকু? কলকাতা!

কেন রে মানিক?

সেই যে তুমি বলেছিলে, কলকাতায় কে তোমার কাকা আছে তার ঘরে হাতী থাকে।

'ও হ্যাঁ যাব, কাল যাব।' বলে কবেকার বলা বিস্মৃত কথাটা একবার মনে করল মহেন্দ্র। যেতে হবে, শেষ চেষ্টা একবার করবে সে।

নবমীর সকালেই রওনা হয়ে গেল মহেন্দ্র কলকাতায়। খোকন ভাল আছে, অতএব চিন্তার কারণ নেই। পূজার আনন্দ তো তার নেই কিছু। রাত্রে পৌঁছাল হাওড়া ষ্টেশনে, রাতটা কাটিয়ে দিল গঙ্গার উপর, পুলের ফুটপাতে শুয়ে বসে। পুলিশে ধরতে পারতো, কিন্তু কি জানি কেন, ওকে কেউ ধরলো না, এমনকি কেউ কোন প্রশ্ন পর্যন্ত করলো না। গামছা বাঁধা কাগজের পুঁটলীটা মাথায় দিয়ে মহেন্দ্র নিরাপদে কাটিয়ে দিল, কিন্তু দশমীর সকাল, সে এখন যায় কোথায়? যেখানে যাবে লক্ষ্য করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, সেখানে যেতেও ভয় করে, কে জানে ওকে ওরা চিনবে কিনা? যদি না চেনে, যদি তাড়িয়ে দেয় অপমান করে?

না, যেতে হবে খোকন বলেছে, "যাবে কাকু? খোকন তার শিশু দেবতা, খোকন তার তপ—জপ আরাধনা, যাবে মহেন্দ্র শ্যামবাজারে ওর পিতৃবন্ধু উমেশ ভট্টাচার্যের বাড়ি, ওর অনেক আশা রয়েছে সেখানে।

মহেন্দ্র উঠে পড়ে, স্নানাদি করা দরকার, বেশটা যা হয়েছে, যেন পথের হন্যে কুকুর। মহেন্দ্র কাছের ঘাটে নামলো গঙ্গাস্নান করতে। ও হরি স্নান করবে কি করে? ওর আর কাপড় নেই, গামছা আছে আর আছে একখানা লুঙ্গি, অতএব মহেন্দ্র স্নান করে লুঙ্গি পরে কাপড়খানা ওখানেই শুকিয়ে নিল। এখন কিছু খেতে হবে। আনা আষ্টেক পয়সা ওর কাছে এখনো। কিন্তু কলকাতা শহরে কি অত কম পয়সায় খাওয়া হয়? সাহস করে মহেন্দ্র কোন দোকানে ঢুকতে পারছে না, যদি বেশি পয়সা খেয়ে ফেলে? কিন্তু দূরন্ত ক্ষুধা পেয়েছে, আর বেলাও তো হয়েছে অনেকটা! মহেন্দ্র ভাবতে ভাবতে হাঁটে অনেক দূর। একটা পার্কে সার্বজনীন দুর্গোৎসব চলছে, কি বিরাট প্যান্ডেল, কী চমৎকার সাজসজ্জা, কী অপরূপ প্রতীমা, মহেন্দ্র দেখতে লাগলো। কত টাকা খরচ করে এতবড় ব্যাপার করা হয়েছে। দশ হাজার, পনের হাজার, বিশ হাজার? হয়তো আরো বেশি। কত কাঙ্গালি ভোজন হবে, চিড়ে কলা, দুই লাইন করে বসেছে সব, মহেন্দ্রকে একজন কর্তৃপক্ষগোছের লোক ঠেলে বললো, বসে যাও, বসে যাও সব—

বসে গেল মহেন্দ্র লাইনের এক জায়গায়। নিজেকে দেখলো, হ্যাঁ ভিক্ষুকের চেয়ে ভালো চেহারা ওর নয় এখন আর, যদিও ওর চেহারা সত্যি ভালো। একমুখ দাঁড়ি, চুল রুক্ষ, তারপর গঙ্গার মেটে জলে আলুথালু গায়ের রং খড়ি মাখা হয়ে গেছে, ধুতী অত্যন্ত ময়লা, কামিজের পিঠখানা ছেঁড়া। এ অবস্থায় কে তাকে ভদ্র বলবে? কিন্তু ভদ্রলোক নিজে ঠেলে বসিয়ে না দিলে কিছুতেই ও লাইনে বসতে পারতো না। বসে কিন্তু ভালোই হলো খাবার পয়সা বেঁচে গেল।

বেশ খেল মহেন্দ্র, পুরো পেট খেল, কাঙালীদের সঙ্গে খেতে খেতে ও ভুলেই গেল যে ও মহেন্দ্র মুখুয্যে, ভদ্র পরিবারের সন্তান আর এখানে এসেছে রোজগারের চেষ্টায়, বরং মনে হচ্ছিল, ও এদেরই সমগোত্রীয়, এই অন্ধ, কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থ অশ্লীলভাষী কথক ভিখারীদের একজন। খাওয়া শেষ হলে কিন্তু মহেন্দ্রের মানসপটে জেগে উঠলো। আাত্মগ্লানি, এতোটা দীনতা স্বীকার করার কোন দরকার ছিল না, একবারে ভিকারী হলেও পারতো। ওর গামছার সঙ্গে লুঙ্গিটা আর দু'খানা পুঁথি উপন্যাস নয়, ঠিক দর্শন শাস্ত্র। ওদের প্রাচীন পরিবারের কে কবে টোল খুলেছিলেন, অন্ন এবং বিদ্যাদান একসঙ্গে করতেন।

পুঁথি এখনও জমা আছে। এই দুইখান মহেন্দ্র তার মধ্যে থেকে বেঁছে এনেছে, যদি কেউ কেনে তো বিক্রি করবে। ও শুনেছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়াম তৈরি করেছে স্যার আশুতোষের নামে। সেখানে পুঁথি দু'টো বিক্রি করার চেষ্টা করবে মহেন্দ্র, অতএব ও এখনও নিঃস্ব নয়। কিন্তু কে জানে, পুঁথি ওরা কেনে কি না।

কয়েক বছর আগের কথা, গ্রামের স্কুলে ম্যাট্রিক পাস করেছে মহেন্দ্র, দাদা তখনও রোজগার করতেন এবং কিছু জমিজমাও ছিল ওদের। তিনি মহেন্দ্রকে পাঁচক্রোশ দূরের হোতমপুর কলেজে ভর্তি করে দিয়ে এলেন, মহেন্দ্র আই. এ. পড়বে। কিন্তু বিধাতা যদি বিরূপ হন তো, মানুষ কতটুকু কি করতে পারেন। অকস্মাৎ দাদার হলো বসন্ত। সেই অসুখে চোখ দু'টি তার নষ্ট হয়ে গেল, এবং তারপরই হলো আরও কি কঠিন ব্যাধি চিকিৎসা করতে যা কিছু ছিল সব বেরিয়ে গেল, রইল যা তা অতি সামান্য। বই কেনা হয় না, কলেজের মাইনে দেওয়া হয় না, বোডিং— এর খরচ জোটে না। নিরুপায় হয়ে মহেন্দ্র একদিন সন্ধ্যাবেলা কলেজ হোস্টেল ত্যাগ করে বাড়ি ফিরলো। খোকন তখন মাত্র এক বছরের। তারপর এই ক'বছর ধরে রোজগারের চেষ্টায় ফিরছে মহেন্দ্র, নানা কাজের সন্ধান কিন্তু বিধি প্রতিকুল। মহেন্দ্র কিছুই করে উঠতে পারল না। ওদের পিতৃদেব ক্ষেত্রনাথ ছিলেন পশ্চিমের এক রাজসভায় সুর শিল্পী এবং কুমারদের সঙ্গীত শিক্ষক? দেশীয় রাজা এবং রাজার স্নেহ ভাজন ছিলেন বলে রোজগার তিনি ভালোই করতেন এবং পৈতৃক বিষয় আর পূজা উৎসব ভালোই চালাতেন। তারই বন্ধু এই উমেশবাবু কলকাতায়, মহেন্দ্র যাবে বলে বেরিয়েছে, ওর রাজ্যের বনবিভাগ থেকেই কাঠের কারবার করে উমেশবাবু নাকি একজন মস্ত ধনী, দাদা দেবেন্দ্র তাঁকে দেখেছেন, মহেন্দ্র কখনো দেখেনি। মহেন্দ্রর ছোট বেলাতেই পিতৃ বিয়োগ হয়, দেবেন্দ্রের বয়স তখন আঠারো তিনিই মহেন্দ্রকে মানুষ করেছেন কিন্তু বাইরে আয় না থাকায় বিষয় সম্পত্তি ক্রমে ক্রমে কমতে কমতে দেবেন্দ্রের অসুখে প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল।

দাদা দেবেন্দ্র—উমেশবাবুকে চেনেন, কিন্তু তিনি এখন অন্ধ, তাই মহেন্দ্র একদিন বলতে শুনেছে উমেশ কাকা বাবার কাছে অনেক সাহায্য পেয়েছিলেন। এখন তিনি মস্ত ধনী, তাঁর কাছে একবার গেলে হয় না। যদি কোনো চাকরির ব্যবস্থা হয়।

ধনীদের কি অত মনে থাকে মহীন। দাদা বলেছিলেন উত্তরে।

—তবু একবার দেখা উচিত।

—বেশ, যাবি! খুব আগ্রহের সঙ্গে তিনি কথাটা বলেননি।

অতঃপর মহীন বলেছিল খোকনকে, মহীন যেমন তার কাকা, তেমনি তারও এক কাকা আছেন কলকাতায়, সেখানে মহীন যাবে আর সেই উপলক্ষ করেই মহীন বেরিয়েছে। কিন্তু এখন যেন আর উৎসাহ পাচ্ছে না মহীন। বড় লোকের বাড়ি, কে জানে কি বলেন তারা। হয়তো ঢুকতেই পারবে না মহেন্দ্র। কিন্তু খোকনকে যে মানুষ করতেই হবে। না, থামলে চলবে না, মহেন্দ্র যাবেই। উঠে পড়লো। শ্যামবাজারের পথ, ট্রাম চলেছে, কিন্তু অনর্থক পয়সা খরচ করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। পূজার—বাজার

সাজানো দোকান আর নানান পোষাকের মানুষ দেখতে দেখতে চলেছে মহেন্দ্র। পথে একটা বাচ্চা ছেলে, খোকন নাকি। চমকে উঠেছিল মহেন্দ্র। কিন্তু—না খোকন এত পোষাক পাবে কোথায়। মহেন্দ্র ছেলেটাকে আর দেখলো না ভালো করে। ঠনঠনের কালীতলায় প্রণাম করল, চাকরি যেন একটা জোটে। তার খোকনের জুতো, জামা, কাপড় যেন সে আসছে বছর কিনতে পারে। মহেন্দ্র জোরে হাঁটতে লাগলো।

অনেকখানি রাস্তা, অপরাহ্ন বেলা, পথের ভিড় কিন্তু মহেন্দ্র আর কোথাও থামলো না। একেবারে বাগবাজারের মোড়ে এসে দাঁড়ালো, হ্যাঁ এইখানে প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে ২৪ নম্বর কাঁঠালপুর লেনটা কোথায়। এক দোকানীকে জিজ্ঞাসা করলো মহেন্দ্র। "আগে যান" বলে দোকানী নিজের কাজে মন দিল কলকাতার দস্তুর এই রকম, বলবেনা যে, জানি না মশাই। মহেন্দ্র অন্য একজনকে জিজ্ঞাসা করলো। লোকটি ভদ্র—তিনি পরিস্কার বুঝিয়ে দিলেন সোজা গিয়ে বাঁ দিকে মোড় ফিরবেন—তারপর প্রথম গলিটাই কাঁঠালপুর লেন। এই মোড়ের প্রকান্ড বাড়িটাই বোধ হয় চব্বিশ নম্বর। মহেন্দ্র নমস্কার করে চলতে লাগলো।

চেহারাটা যা হয়েছে, চেনা যায় না, কিন্তু কিছুই করবার নাই। না আছে কাপড় বা আয়না চিরুনী। মোটা ধুতিটা হাঁটুর উপর কুঁকড়ে উঠেছে। মহেন্দ্র টেনে নামালো। মাথার চুল যথাসাধ্য বাগিয়ে নিল একটা রাস্তার কলের জল ছিটিয়ে গামছা পুঁটলিটাও একটু চৌকস করে বেঁধে নিল। তবুও ভদ্র বললো না মহেন্দ্র। দুর চাই। চলো—যা হয় হবে। মহেন্দ্র অনাসক্তবৎ চলতে লাগলো, যেন দারওয়ান গলাধাক্কা দিলেও সে অপমান বোধ করবে না, নিঃশব্দে ফিরে আসবে।

কাঁঠালপুর লেন মোড়েই মস্ত বাড়িটা চব্বিশ নম্বর। গেটে তিনজন দারওয়ান। তারপর বাগান, তার ওপারে তিনতলা বাড়ি, যেন ছবি একখানা। বাড়ির দক্ষিণ দিকে খোলা লেন— সেখানে জাল খাটিয়ে কয়েকজন যুবক যুবতী টেনিস খেলছে। দেখতে পাচ্ছে মহেন্দ্র।

এই বাড়িটাই তো। মহেন্দ্র নিজের মনেই প্রশ্ন করলো, হ্যাঁ নেমপ্লেট রয়েছে ইউ সি, ভট্টাচার্য—টিম্বার মার্চেন্ট এন্ড কন্ট্রাক্টর। ঢুকবে না, মহেন্দ্র এক মিনিট ভাবলো। কিন্তু ফিরলে চলবে না। মহেন্দ্র সটান গেটের মধ্যে ঢুকে পড়লো। দারওয়ানরা ওকে আটকাবে না তো? না কেউ কিছু বলবো না— হয়তো বহু লোক এমন যায় আসে বলে কেউ ওকে বাধা দিল না। বাগান পার হয়ে মহেন্দ্র বাড়ির বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ভেতরে হলঘর দেখা যাচ্ছে, সেখানে চারজন লোক, একজন ইজিচেয়ারে। ইনিই বোধ হয় উমেশবাবু। মহেন্দ্র আন্দাজ করছে বাইরে দাঁড়িয়ে। একটা চাকর ওকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে গেল। গাড়ি বারান্দায় দাঁড়ানো মোটর থেকে এজন ড্রাইভার উঁকি দিয়ে দেখলো। একটা মস্তবড় কুকুর ভেতর

থেকে বেরিয়ে এসে ওর কাপড় শুঁকছে, এইবার হয়তো ঘেউ ঘেউ করে তাড়া করবে।

কিন্তু কুকুরটা তাড়া করবার পূর্বেই ইজি চেয়ারস্থ বৃদ্ধের নজর পড়লো দরজার দিকে। মাথাটা তুলে তিনি বললেন—

—কে? কি চান?

—আজ্ঞে, আমি— বলতে বলতে সেই দামী কার্পেট পাতা মেঝেতে ধুলো মলিন পায়ই ঢুকে পড়লো মহেন্দ্র এবং ভুমিষ্ঠ হয়ে তার পদ প্রণাম করলো গিয়ে, তারপর বললো—আমি চন্ডীপুর থেকে আসছি—ক্ষেত্রনাথ মুখুর্যের ছেলে আমি।

অ্যাঁ। বলে বৃদ্ধ যেন চমকে চেয়ার ছেড়ে খাড়া হয়ে গেলেন, তারপর মহেন্দ্রের চিবুক ধরে বললেন এসো বাবা, এসো, মা ভাল আছেন।

মা গঙ্গালাভ করেছেন বছর দশেক হলো।

—ওহো—দাদা, দেবেন্দ্র।

হ্যাঁ দাদা—বসন্ত হয়ে দাদা অন্ধ হয়ে গেছেন।

—অন্ধ। বলে বৃদ্ধ গভীর বেদনার্তভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন মহেন্দ্রের মুখ পানে!

মহেন্দ্র আশা করেনি, এতোটা স্নেহ এই ধনীর প্রাসাদে, একটু পরে বৃদ্ধ আবার বললেন— সবই ভগবানের ইচ্ছা। বাড়িতে আর কে আছো তাহলে?

দাদা, বৌদি—আর একটা খোকন, বছর সাতেকের। বস, বস, এই চেয়ারটায় এইযে এইখানে বলে একবার নিজের ডান দিকে বড় চেয়ারখানা নির্দেশ করে দিলেন তিনি। অন্য বন্ধুগণ এতক্ষণ উপদ্রবটাকে ঘৃণার চোখে দেখছিলেন, ভেবেছিলেন চাকর বাকর বা বড় জোর চাকুরির উমেদার হবে, কিন্তু এখন বুঝলেন এ ছোকরা এখন যাবে না।

কাজেই ওদের একজন গাত্রোত্থান করে বললেন আমার একটু কাজ রয়েছে স্যার—আজ তবে উঠি।

—ও উঠবে। আচ্ছা। এই ছেলেটি আমার বাল্যবন্ধু ক্ষেত্রের ছেলে। অনেক বার আমি ক্ষেত্রনাথের কথা আপনাদের বলেছি, সেই ক্ষেত্রনাথ।

তিনজন উঠে গেলেন। শেষের লোকটার হয়তো কিছু কথা ছিল, তখনো রইলেন। বাইরে টেনিস লনে যারা খেলা করছিল, তারা অকস্মাৎ হৈ চৈ করে বারান্দায় উঠে এলো— মহেন্দ্র দেখলো তাদের। দু'টি মেয়ে, চারজন পুরুষ। ওরা এবার বারান্দায় বেতের চেয়াগুলোতে বসে চা খাবে, তার আয়োজন চলছে। আকাশে মেঘ ছিল, বৃষ্টি পড়ছে তাই ওরা বারান্দায় এলো।

যে ভদ্রলোকটি এতক্ষণ বসেছিলেন তিনি এবার ধীরে ধীরে বললেন লাখ খানেক টাকাতেই হয়ে যেতে পারে ওটা। আপনি নিজে একবার দেখুন, প্রকাণ্ড বাগান বাড়ি প্রায় দেড়শ বিঘে জমি তবে একটু দূরে নইলে ওর দাম তিন লাখের কম হতো না।

—আচ্ছা আমি ভেবে দেখবো, আজ আপনি যান, আজ আর সময় হবে না, বলে উমেশবাবু মহেন্দ্রের দিকে চেয়ে বললেন,—হাত মুখ ধোও বাবা, চা খাবে। ওরে কে আছিস, এদিকে আয়।

একটা চাকর এসে দাঁড়ালো। এই চাকরটাই কিছুক্ষণ আগে মহেন্দ্রকে দরজায় দেখে গিয়েছিল? উমেশবাবু বললেন—একে পাশের বাথরুমটা দেখিয়ে দে আর তোয়ালে সাবান এনে দে।

চাকরটা এবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মহেন্দ্রের দিকে চেয়ে চলে গেল। সে চাহনি এমনি অবজ্ঞাসূচক যে মহেন্দ্রের মনে হলো এখনি উঠে যাবে এখান থেকে। কিন্তু বাড়ির মালিকের সেই কোমল দৃষ্টি ওর সর্বাঙ্গে আপতিত রয়েছে। মহেন্দ্র স্থির হলো। ঠিক সেই সময় ঢুকল এক যুবক।

—এই যে অতীন, বৃদ্ধ বললেন—এই আমার বন্ধু ক্ষেত্রের ছোট ছেলে। এই মাত্র এলো দেশ থেকে।

মহেন্দ্র উঠে প্রণাম করতে যাবে, কিন্তু অতীন্দ্র নামধারী যুবকটির দৃষ্টি তার দিকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মহেন্দ্র বুঝতে পারলো উনি প্রণামটা পছন্দ করবেন না। সে হাত তুললো কিন্তু অতীন তার পানে এক নিমেষ দৃষ্টিপাত করেই বললো, ও আচ্ছা—বাণ কোম্পানীর কাজটা তাহলে ধরছি বাবা। এক লক্ষ বিশ হাজার টাকায় রফা হলো বলেই বগলের ফাইলটা বৃদ্ধের সামনে ফেলে এক মিনিট কি একটা কাগজ দেখলো, তারপর সটান গিয়ে ঢুকলো হল ঘরের পাশের একটি ঘরে যার খোলা দরজার ফাঁকে মহেন্দ্র দেখতে পাচ্ছিল এক বব করা মেমসাহেব খটখট টাইপ করে চলেছে। ওটা হয়তো অফিস ঘর। মহেন্দ্র ভাবতে লাগলো। এই নিদারুণ ধনলোভী মানুষগুলোর কাছে সে কেন এসেছে, কি সে এখানে পাবে। আপনার দীন বেশ তাকে ক্রমাগত কুণ্ঠিত করতে করতে প্রায় চেয়ারের সাথে মিলিয়ে এনছে কিন্তু উমেশবাবুর স্নেহদৃষ্টি তেমনি উজ্জ্বল তার সর্বাঙ্গ যেন প্লাবিত করে বয়ে যাচ্ছে।

—যতীন, বৃদ্ধ ডাকলেন জোরে। বারান্দায় চা পানরত একজন সুন্দর বলিষ্ঠকায় যুবক উঠে আসতে বললো—

ডাকছেন বাবা।

হ্যাঁ শোন, এই আমার বন্ধুর ছেলে চন্ডীপুর থেকে এসেছে, এইমাত্র এল। ও হ্যাঁ, যতীন তাকিয়ে দেখলো মহেন্দ্রকে একবার, তারপর আস্তে বললো, বেশ তো,

বসুক। কুমার নৃপেন্দনারায়ণ এসেছেন বাবা, আমি তাঁকে চা টা খাইয়ে নিই। তারপর ওর সঙ্গে আলাপ করবো। নাম কি তোমার? শেষের প্রশ্নটা মহেন্দ্রকে।

—মহেন্দ্র অতি ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিল মহেন্দ্র।

আচ্ছা বস বলেই যতীন চলে গেল ব্যস্ত ভাবে।

তোয়ালে আর সাবান আনতে গেছে যে চাকরটা সে এখনও ফিরলো না, হয়তো ভুলেই গেছে মহেন্দ্রের কথা। বড় লোকের বাড়ির চাকর, কে আর মহেন্দ্রের মত অতিথিকে পছন্দ করে।

ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা বাজলো ঢং করে। ঠিক সেই সময় সুন্দর টেডি পরিহিত জনৈক যুবক আর তাঁর সঙ্গে দু'টি মেয়ে এসে ঢুকলো বারান্দা থেকে ঘরে। যুবক বললো—

শরীর ভালো আছে তো জ্যাঠামশায়? তখন লোক ছিল তাই দেখা করতে পারি নি।

—হ্যাঁ ভালো আছি। রাজবাহাদুর দার্জিলিং থেকে ফিরছেন নাকি?

'না— বাবা নভেম্বরে ফিরবেন আমি তাড়াতাড়ি চলে এলাম।

বেশ, চা—টা খেলে বাবা? খেলা হলো তোমাদের?

আজ্ঞে হ্যাঁ এবার যাব। বলে কুমার একচোখে মহেন্দ্রকে দেখলো।

বৃদ্ধ বললেন, ও আমার বন্ধুর ছেলে কাজকর্মের সন্ধানে এসেছে!

ও, তাই নাকি? পড়াশুনা করেছো কিছু? কুমার প্রশ্ন করলো, যেন কাজ সে দিতে পারে এক্ষুনি। বৃদ্ধ তাকালেন মহেন্দ্রের পানে। মহেন্দ্র দুর্বল কণ্ঠে ধীরে ধীরে বললো—

পড়াশুনা বিশেষ কিছু করতে পারিনি, ম্যাট্রিক পাশ করার পরই দাদার অসুখ তারপর দুঃখে দৈন্যে এই কটা বছর কাটছে।

ম্যাট্রিক! বলে কুমার যেন আতকে উঠলো, ওতে কি চাকুরী জুটবে?

আচ্ছা দেখা যাবে, বলে তিনি যেমন কিছুটা বিদ্রুপ মাখা মৃদু হেসে চলে যাচ্ছেন, ঠিক সেই সময় বৃদ্ধের পিছনের ঘরটায় মৃদু গুঞ্জন ধ্বনিত হয়ে উঠল মধুর কণ্ঠে।

কে যেন সন্ধ্যাদ্বীপ জ্বালছে।

এ ঘরের সবকটি প্রাণী নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেছে, কুমার বাহাদুরও দাঁড়িয়ে গেল, বৃদ্ধের যেন যৌবন ফিরে এসেছে অকস্মাৎ সোজা হয়ে ডাকলেন—মাধু মা। যাই বাবা। দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল এক অষ্টাদশী তরুণী, ডান হাতে ধুপদানী, বাঁ হাতে প্রদীপ। গৈরিক বর্ণের তনুদেহ দিয়ে জ্যোতিরেখা যেন উদ্ভাসিত হচ্ছে। দীর্ঘায়িত চোখে অবর্ণনীয় এক কোমলাভ। বৃদ্ধ বললেন, তোর বাবাকে

টাইফয়েডের সময় বাঁচিয়ে ছিল যে ক্ষেত্র, তারই ছেলে। দীপ হাতে দাঁড়িয়ে গেল মেয়েটি, আধ মিনিট দেখলো মহেন্দ্রকে, তারপর বলল পায়ে জুতো নেই কেন?

কিনবার পয়সা নেই। মহেন্দ্র মাথা নীচু করে জবাব দিল।

—জামাকাপড় অত নোংরা।

—ওই একই কারণে।

—তা অত হেটমুণ্ড হবার কি হয়েছে। দুনিয়ার সবাই বড়লোক হয় না। উঠুন আসুন আমার সঙ্গে বলে ধুপদানী আর দীপ নিয়ে সে এগুলো।

—যাও বাবা। বললেন বৃদ্ধ, তারপর মেয়েকে বললেন ও পাড়াগাঁয়ের ছেলে মা, দেখিস কেউ যেন কিছু না বলে।

—তোমার কিছু ভাবনা নাই বাবা—আমি এক্ষুণি ওকে ঘষে মেজে হীরের মতো ধারালো করে দেব, বলে সঞ্চায়িনী লতার মত সে এগিয়ে যাচ্ছে, মহেন্দ্রও উঠলো, পিছনে চললো। মেয়েটিও কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেছে। সে গামছার পুটলীটা পড়ে রইল ওখানেই। ভুলে গেছে নিয়ে যেতে। বৃদ্ধ সেটা সযত্নে তুলে নিজের চেয়ারের মাথায় রাখলেন, বললেন ওরে রামু, এইটা দিয়ে আয় তো—

কুমার নৃপেন্দ্রনারায়ণের চোখ দু'টো অকস্মাৎ জ্বলে উঠেছিল, কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য পরক্ষণেই শান্ত সহাস্য কণ্ঠে বললেন—

একেবারে হীরকের মতো ধারালো হয়ে যাবে ওই পাড়াগাঁয়ের ভুত।

ওর কথা ওই রকম বললো। ওখানে দাঁড়ানো একটি মেয়ে সম্ভবত কুমারের বোন। বৃদ্ধের মেঝ ছেলে যতীন এতক্ষণে বললো, বড়দার অফিসেই একটা কাজে ওকে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে বাবা, আপনি ভাববেন না।

আমারই তো একটা লোকের দরকার। কুমার বললো, অবিশ্যি কাজটা তেমন ভাল কিছু নয় বাজার সরকার।

বৃদ্ধ মুখ তুলে চাইলেন, বললেন, এসেছে দু'দিন থাক, পরে দেখা যাবে। অন্য কেউ আর কিছু বলবার পূর্বেই বৃদ্ধ বেরিয়ে গেলেন বাগানের দিকে।

মাধুরীর পেছনে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো মহেন্দ্র। সাদা মার্বেলের মেঝে ওর খালি পা পিছলে যাচ্ছে। চকচক করছে দেয়াল, তাতে উজ্জ্বল ইলেকট্রিক আলো গলে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়—মহেন্দ্রের আয়ত চোখ জলভরা হয়ে গেল ঘরের আত্যুজ্জ্বল আলোধার দিকে তাকিয়ে। কামরা সাজানো, গোছানো যেন ইন্দ্রভবন' কত আসন, কুশন আসবাব, চেনে না, মহেন্দ্র।'

ওইটা বাথরুম ওখানে গিয়ে সাবান দিয়ে গা ধোন তেল মাখুন,

আয়না চিরুণী সব আছে আমি আসছি বলে চলে যাচ্ছে কিন্তু মহেন্দ্র ওই কোনায় মেহগিনি কাঠের একটা চকচকে দরজা ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না